

বুদ্ধদেব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বুদ্ধদেব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

ভগবান বুদ্ধের সার্ধদ্বিসাহস্রিক পরিনির্বাণ-জয়ন্তী-উপলক্ষে

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখী পূর্ণিমা, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩
পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৬৭ : ১৮৮২ শক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্ক্‌স্‌ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩

২·১

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

১ ষষ্ঠ শতক। সারনাথ। বর্তমানে নিউ দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়মে রক্ষিত। আলোকচিত্র শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী -কর্তৃক গৃহীত ও তাঁহারই সৌজন্যে মুদ্রিত।

২ গুপ্তযুগ। সারনাথ। আলোকচিত্র শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, আশুতোষ মিউজিয়ম ও আর্কিয়লজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে।

৩ ২০ অক্টোবর ১৯২২। নালন্দায় বুদ্ধমূর্তির আরতি-দর্শনে অঙ্কিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর কার্ড্-স্কেচ হইতে।

বুদ্ধদেব

প্রার্থনা

কামনা, কামনা — ডেকে ডেকে যুগে যুগান্তরে
নিষ্ঠুর নিষ্করুণ দুষ্ট যবে দেখি ঘরে ঘরে
প্রহরে প্রহরে; দেখি অন্ধ মোহ দুরন্ত প্রাণাংশে
কুঙ্কুমার [redacted] বহ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে সর্বাংশে
নিঃসহায় দুর্বলের সকরুণ সকল [redacted] প্রত্যাশা,
জীবনের সকল সম্বল; দুঃখীর আশ্রয় ভরসা
নিশ্চিন্তে ভাসিয়া যায়ে দুর্দম দুরাশার হোমানলে
আহুতি ইন্ধন জোগাইতে; নিঃসংকোচ গর্বে চলে
আত্মতৃপ্তি মগ্ন হতে হতে; দেখি আত্মম্ভরী প্রাণ
তুচ্ছ করিবারে পারে মানুষের গভীর সম্মান
গৌরবের মৃগতৃষ্ণিকায়; [redacted] সিদ্ধির অহংকার তরে
জীবের সর্বস্ব সার্থকতা দলি দেয় ধূলি পরে
জয়যাত্রাপথে, — দেখি বিদ্রূপে ভরিয়া উঠে মন,
আত্মঘাতি-মাৎস্যন্যায় [redacted] মানুষের প্রাণ-নিকেতন
উন্মীলিছে [redacted] হিংস্র দুই নখে দন্তে বিভীষিকা [redacted], — চিত্ত মম
নিষ্কৃতি সন্ধানে ফিরে পিঞ্জরিত বিহঙ্গমসম,

মুহূর্তে মুহূর্তে আনে শুভ্রশম-নূতন সম্ভার
সংসারের। হেনকালে জ্বলি উঠে উগ্রাগ্নি সমান
চিত্তে তাঁর দিব্যমূর্তি, সেই বীর রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া, বিসর্জিয়া সর্ব অহংকার
বর্তমান কাল হতে বিচ্ছিন্নিলা নিত্যকাল মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা বন্দীশালা হতে।— ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রেই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারালো যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস
তোমারি করুণা-বিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি।— আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুধি, বোসো তাহাদেরি দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি', প্রমাদ-বিহ্বল সংসারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসীম অহংকার
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯ জুলাই
১৯৩৩

বুদ্ধদেব

আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলঙ্কার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল— যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর

মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করি নি?

তখনি আবার এই কথা মনে হল যে, বর্তমান কালের পরিধি অতি সংকীর্ণ, সদ্য উৎক্ষিপ্ত ঘটনার ধূলি-আবর্তে আবিল, এই অল্পপরিসর অস্বচ্ছ কালের মধ্যে মহামানবকে আমরা পরিপূর্ণ করে উপলব্ধি করতে পারি নে ইতিহাসে বার-বার তার প্রমাণ হয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ক্ষুদ্র মনের কত ঈর্ষা, কত বিরোধ তাঁকে আঘাত করেছে; তাঁর মাহাত্ম্য খর্ব করবার জন্যে কত মিথ্যা নিন্দার প্রচার হয়েছিল। কত শত লোক যারা ইন্দ্রিয়গত ভাবে তাঁকে কাছে দেখেছে তারা অন্তরগত ভাবে নিজেদের থেকে তাঁর বিপুল দূরত্ব অনুভব করতে পারে নি, সাধারণ লোকালয়ের মাঝখানে থেকে তাঁর অলৌকিকত্ব তাদের মনে প্রতিভাত হবার অবকাশ পায় নি। তাই মনে করি, সেদিনকার প্রত্যক্ষ ধাবমান ঘটনাবলীর অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁকে যে দেখি নি সে ভালোই হয়েছে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা জন্মমুহূর্তেই স্থান গ্রহণ করেন মহাযুগে, চলমান কালের অতীত কালেই তাঁরা বর্তমান, দূরবিস্তীর্ণ ভাবী কালে তাঁরা বিরাজিত। এ কথা সেদিন বুঝেছিলুম সেই মন্দিরেই। দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে, সে একাগ্রমনে করজোড়ে

আবৃত্তি করতে লাগল : আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন ; আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তাঁরই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপপরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম ; তাঁর জন্মদিন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ মুক্তিকামীর জীবনের মধ্যে। সেদিন সে আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার দীপ্তশিখায় সম্মুখে দেখতে পেয়েছে তাঁকে যিনি নরোত্তম। যে বর্তমান কালে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেদিন যদি তিনি প্রতাপশালী রাজরূপে, বিজয়ী বীররূপেই প্রকাশ পেতেন, তা হলে তিনি সেই বর্তমান কালকে অভিভূত করে সহজে সম্মান লাভ করতে পারতেন ; কিন্তু সেই প্রচুর সম্মান আপন ক্ষুদ্র কালসীমার মধ্যেই বিলুপ্ত হ'ত। প্রজা বড়ো করে জানত রাজাকে, নির্ধন জানত ধনীকে, দুর্বল জানত প্রবলকে— কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতাকে সাধনা করছে যে মানুষ সেই স্বীকার করে, সেই অভ্যর্থনা করে মহামানবকে। মানব-কর্তৃক মহামানবের স্বীকৃতি মহাযুগের ভূমিকায়। তাই আজ ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানবমনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীত কালের মহৎপ্রকাশ

বর্তমানকে অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিত্তবিকারে আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজও তাঁরই কাছে বলতে আসছে: বুদ্ধের শরণ কামনা করি। এই সুদূর কালে প্রসারিত মানবচিত্তের ঘনিষ্ঠ উপলব্ধিতেই তাঁর যথার্থ আবির্ভাব।

আমরা সাধারণ লোক পরস্পরের যোগে আপনার পরিচয় দিয়ে থাকি; সে পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির, বিশেষ সমাজের। পৃথিবীতে এমন লোক অতি অল্পই জন্মেছেন যাঁরা আপনাতে স্বতই প্রকাশবান্, যাঁদের আলোক প্রতিফলিত আলোক নয়, যাঁরা সম্পূর্ণ প্রকাশিত আপন মহিমায়, আপনার সত্যে। মানুষের খণ্ড প্রকাশ দেখে থাকি অনেক বড়ো লোকের মধ্যে; তাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা বিদ্বান, তাঁরা বীর, তাঁরা রাষ্ট্রনেতা; তাঁরা মানুষকে চালনা করেছেন আপন ইচ্ছামত; তাঁরা ইতিহাসকে সংঘটন করেছেন আপন সঙ্কল্পের আদর্শে। কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয় নি রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।

মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছে: আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি।

যিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে সত্যকে যিনি এমনি করে জেনেছেন তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানবমহিমায় দেদীপ্যমান।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।

মানুষের এই প্রকাশ জগতে আজ অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবৃত। কিছু কিছু দেখা যায়, অনেকখানি দেখা যায় না। পৃথিবীসৃষ্টির আদিযুগে ভূমণ্ডল ঘন বাষ্প-আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানে সেখানে উচ্চতম পর্বতের চূড়া অবারিত আলোকের মধ্যে উঠতে পেরেছে। আজকের দিনে তেমনি অধিকাংশ মানুষ প্রচ্ছন্ন, আপন স্বার্থে, আপন অহঙ্কারে, অবরুদ্ধ চৈতন্যে। যে সত্যে আত্মার সর্বত্র প্রবেশ সেই সত্যের বিকাশ তাদের মধ্যে অপরিণত।

মানুষের সৃষ্টি আজও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। এই অসমাপ্তির নিবিড় আবরণের মধ্যে থেকে মানুষের পরিচয় আমরা পেতুম কী করে যদি না মানব সহসা আমাদের কাছে আবির্ভূত হ'ত কোনো প্রকাশবান্ মহাপুরুষের মধ্যে?

মানুষের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে, মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। ন ততো বিজুগুপ্সতে— আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, দেশকালের কোন্ সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে, কোন্ সত্ত্বপ্রয়োজনসিদ্ধির প্রলুব্ধতায়?

ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি, এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দুস্তর গিরি-সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি— মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ। এই ঘোষণাবাক্য অক্ষয় রূপ নিল মরুপ্রান্তরে

প্রস্তরমূর্তিতে। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধ-বন্দনা, মূর্তিতে, চিত্রে, স্তূপে। মানুষ বলেছে, যিনি অলোক-সামান্য দুঃসাধ্য সাধন ক'রেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে; নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তারা আঁকল ছবি, দুর্বহ প্রস্তরখণ্ডগুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে মন্দির, শিল্প-প্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্পসম্পদ রচনা করলে, শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই মন্ত্র দান করে গেল: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম সুবৃহৎ স্তূপ পরিবেষ্টন ক'রে শত শত মূর্তি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতককথার বর্ণনায়; তার প্রত্যেকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও লেশমাত্র আলস্য নেই, অনবধান নেই; এ'কে বলে শিল্পের তপস্যা, একই সঙ্গে এই তপস্যা ভক্তির— খ্যাতি-লোভহীন নিষ্কাম কৃচ্ছ্রসাধনায় আপন শ্রেষ্ঠশক্তিকে উৎসর্গ করা চিরবরণীয়ের চিরস্মরণীয়ের নামে। কঠিন দুঃখ স্বীকার ক'রে মানুষ আপন ভক্তিকে চরিতার্থ করেছে; তারা বলেছে, যে প্রতিভা নিত্যকালের সর্বমানবের ভাষায় কথা বলে সেই অকৃপণ প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ না করতে পারলে কোন্ উপায়ে যথার্থ করে বলা হবে 'তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে সকল কালের জন্যে'? তিনি মানুষের কাছে

সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা দুঃসাধ্য, যা চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি, শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্জন গুহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে।

এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে! সেই রাজাকে মাহাত্ম্য দান করেছেন যে গুরু তাঁকে আহ্বান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয় নি যেদিন তিনি জন্মেছিলেন এই ভারতে। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ ব'লে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে। সকলের চেয়ে বড়ো দান যে শ্রদ্ধাদান, তার থেকে কোনো মানুষকে তিনি

বঞ্চিত করেন নি। যে দয়াকে, যে দানকে তিনি ধর্ম বলেছেন সে কেবল দূরের থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে অর্থদান নয়, সে দান আপনাকে দান— যে দানধর্মে বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'। নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমান, পুণ্যাভিমান, ধনাভিমান প্রবেশ ক'রে দানকে অপমানকর অধর্মে পরিণত করতে পারে এই ভয়ের কারণ আছে ; এইজন্যে উপনিষদ্ বলেন : ভিয়া দেয়ম্। ভয় ক'রে দেবে। যে ধর্মকর্মের দ্বারা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার আশঙ্কা আছে তাকেই ভয় করতে হবে। আজ ভারতবর্ষে ধর্মবিধির প্রণালীযোগে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধার পথ চারি দিকে প্রসারিত হয়েছে। এরই ভয়ানকত্ব কেবল আধ্যাত্মিক দিকে নয়, রাষ্ট্রীয় মুক্তির দিকে সর্বপ্রধান অন্তরায় হয়েছে এ প্রত্যক্ষ দেখছি। এই সমস্যার কি কোনো দিন সমাধান হতে পারে রাষ্ট্রনীতির পথে কোনো বাহ্য উপায়ের দ্বারা ?

ভগবান্ বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখ-মোচনের সঙ্কল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল ? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ ? কেউ ছিল কি অনার্য ? তিনি তাঁর সব-কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো

তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে ?

জিজ্ঞাসা করি, মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দিয়ে আমরা কী পেরেছি ঠেকাতে ? ছিল আমাদের পরিপূর্ণ ধনের ভাণ্ডার ; তার দ্বার, তার প্রাচীর, বাইরের আঘাতে ভেঙে পড়ে নি কি ? কিছু কি তার অবশিষ্ট আছে ? আজ প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলেছি মানুষের প্রতি আত্মীয়তাকে অবরুদ্ধ করে, আজ দেবতার মন্দিরের দ্বারে পাহারা বসিয়েছি দেবতার অধিকারকেও কৃপণের মতো ঠেকিয়ে রেখে। দানের দ্বারা, ব্যয়ের দ্বারা, যে ধনের অপচয় হয় তাকে বাঁচাতে পারলুম না ; কেবল দানের দ্বারা যার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়, মানুষের প্রতি সেই শ্রদ্ধাকে সাম্প্রদায়িক সিন্ধুকের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখলুম। পুণ্যের ভাণ্ডার বিষয়ীর ভাণ্ডারের মতোই আকার ধরল। একদিন যে ভারতবর্ষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপন মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করে তুলেছিল আজ সে আপন পরিচয়কে সঙ্কুচিত করে এনেছে ; মানুষকে অশ্রদ্ধা ক'রেই সে মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হল। আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে ; কেননা মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এত সন্দেহ, এত আতঙ্ক, এত আক্রোশ। তাই আজ মহামানবকে এই ব'লে ডাকবার দিন এসেছে : তুমি

আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।

ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হল, সে জয় বাহুবলের। কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয়, এইজন্যে মানুষের ইতিহাসে সে জয় নিষ্ফল হল, সে জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরে নি। তাই মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ক'রে মানবের গুরু বলেছেন : ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের ক্রোধকে। এ না হলে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ। বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতি-হিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না, ক্ষমাই আনে শান্তি, এ কথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপ-রাধ বেড়ে চলবে ; রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন কিছুতে নিভবে না ; জেলখানার দানবিক নিষ্ঠুরতায় এবং সৈন্যনিবাসের সশস্ত্র ভ্রূকুটিবিক্ষেপে পৃথিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দুঃসহ হতে থাকবে— কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না। পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্কোধেন

জিনে কোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক ; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে ; যে মুক্তি রাগদ্বেষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।)

[বৈশাখী পূর্ণিমা : ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২]

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না ব'লে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গ'ড়ে ওঠে ; শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে : প্রাণীকে হত্যা করবে না —এই কথাটি শীল। ন চাদিন্নমাদিয়ে : যা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা নেবে না—এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে : মিথ্যা কথা বলবে না—এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া : মদ খাবে না —এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি ক'রে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্যশ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন : ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্সরতি।

শীলসকলকে কী বলে অনুস্মরণ করেন ?

অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি, ভুজিস্-

সানি, বিঞ্‌ঞুপ্‌পসত্থানি, অপরামট্‌ঠানি, সমাধিসংবত্তনিকানি।

অর্থাৎ, আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি, অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে। এই ব'লে আর্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারম্বার স্মরণ করেন।

এই শীলগুলিই হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলেছেন তা মঙ্গলসুত্তে কথিত আছে। সেটি অনুবাদ করে দিই—

বহূ দেবা মনুস্‌সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, 'বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো।'

বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন—

অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চ পূজনেয়্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অসৎগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে

পূজা করা —এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

পতিরূপদেসবাসো পুব্বে চ কতপুঞ্‌ঞতা
অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।

যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্মে প্রণিধান করা —এই উত্তম মঙ্গল।

বহুসথঞ্চ সিপ্‌পঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্‌খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বহু-শাস্ত্র-অধ্যয়ন, বহু-শিল্প-শিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা —এই উত্তম মঙ্গল।

মাতাপিতু-উপট্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সংগহো
অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

মাতাপিতাকে পূজা করা, স্ত্রীপুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা —এই উত্তম মঙ্গল।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞ্‌ঞাতকানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম —এই উত্তম মঙ্গল।

আরতী বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞ্‌ঞমো
অপ্‌পমাদো চ ধম্মেসু এতং মঙ্গলমুত্তমং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে

অপ্রমাদ—এই উত্তম মঙ্গল।

গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্ঠী চ কতঞ্ঞুতা
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্মকথাশ্রবণ—এই উত্তম মঙ্গল।

খন্তী চ সোবচস্সতা সমণানঞ্চ দস্সনং
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা—এই উত্তম মঙ্গল।

তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্সনং
নিব্বানসচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সৎকার্য—এই উত্তম মঙ্গল।

ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই—সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থি গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি।

এই রকম যারা করেছে তারা সর্বত্র অপরাজিত, তারা সর্বত্র

স্বস্তি লাভ করে, তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?

যদি শূন্যতাই হ'ত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে, 'নয় নয় নয়' বলতে বলতে, একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই, সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।

কিন্তু, বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উল্টা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে, মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ, তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো-একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু, প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা; সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে

আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ ক'রে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনাসংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম 'মেত্তিভাবনা'—মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে : সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, সব্বে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক।

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষা থাকলে এই মৈত্রীভাবনা সত্য হয় না, এইজন্য শীলগ্রহণ শীলসাধন প্রয়োজন। কিন্তু, শীলসাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন ক'রে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা, এ তো শূন্যতার পন্থা নয়।

তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করণীয় মত্থ কুসলেন
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ
সক্কো উজূ চ সুহুজূ চ
সুবচো চস্‌স মূহু অনতিমানী।

শান্তপদ লাভ করে পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই— তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সুভাষী, মৃদু, নম্র এবং অনভিমানী হবেন।

সন্তুস্‌সকো চ সুভরো চ,
অপ্‌পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
অপ্‌পগব্‌ভো কুলেসু অনহুগিদ্ধো।

তিনি সন্তুষ্টহৃদয় হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে ; তিনি নিরুদ্‌বেগ, অল্পভোজী, শান্তেন্দ্রিয়, সদ্‌বিবেচক, অপ্রগল্‌ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি
যেন বিঞ্‌ঞূ পরে উপবদেয্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হোক, নিরাপদ হোক, সুস্থ হোক।

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্‌সকা অণুকথূলা।
দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

যে কোনো প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম কী স্থূল, কী দৃষ্ট কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে, অনবশেষে সকলেই সুখী-আত্মা হোক।

ন পরোপরং নিকুব্বেথ
নাতিমঞ্‌ঞেথ কত্থচি ন কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্‌ঞা
নঞ্‌ঞ মঞ্‌ঞস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয্য।

পরস্পরকে বঞ্চনা কোরো না, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ ক'রে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরো না।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে

এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেইপ্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

ঊর্ধ্বে অধোতে চার-দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত, এইপ্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়— মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন

সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু, বড়ো কথাই যে হচ্ছে, বড়ো কথাকে ছোটো কথা ক'রে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন: ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়োকেই, জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট ক'রে, পরিষ্কার ক'রে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান্ বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন; তাকে ছোটো ক'রে, ঝাপসা ক'রে, সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত ক'রে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু, এ তো আমরা একেবারে পারব না। এই দিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ বুঝতে পারব আমরা কতদূর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে

আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কি না, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্ছে কি না, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কি না তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা-কোনো নির্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব এক দিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা-দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে, আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে, ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ, এক দিকে বাধা কাটছে আর-এক দিকে স্বরূপলাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।

১১ চৈত্র [১৩১৫]

ডাক্তার রিচার্ড্ দীর্ঘকাল চীনদেশে বাস করিতেছেন। তিনি খৃস্টান মিশনরি।

তিনি লিখিতেছেন, একবার তিনি কার্যবশত ন্যান্কিং শহরে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রকাশ-সভা আছে। টাইপিং বিপ্লবের সময় যে-সকল গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে তাহাই পুনরুদ্ধার করা এই সভার উদ্দেশ্য।

এই সভার প্রধান উদ্যোগী যিনি তাঁহার নাম য়াঙ্ বেন্ হুই। তিনি চীনের রাজপ্রতিনিধির অনুচররূপে দীর্ঘকাল য়ুরোপে যাপন করিয়াছেন। কন্ফুসীয় শাস্ত্র-শিক্ষায় তিনি উচ্চ-উপাধি-ধারী।

ডাক্তার রিচার্ড্ তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কন্ফুসীয় উপাধি লইয়া কী করিয়া বৌদ্ধ হইলেন', তিনি উত্তর করিলেন, আপনি 'মিশনরি' হইয়া আমাকে এমন প্রশ্ন করিলেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি। আপনি তো জানেন, কেবলমাত্র সাংসারিক ব্যাপারের প্রতিই কন্ফুসীয় ধর্মের লক্ষ— যাহা সংসারের অতীত তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই।' রিচার্ড্ সাহেব কহিলেন, 'যাহা সংসারের অতিবর্তী, তাহার সম্বন্ধে মানবমনের যে প্রশ্ন, বৌদ্ধধর্মে তাহার কি কোনো সত্য মীমাংসা আছে?' তিনি কহিলেন,

'হাঁ।' পাদ্রিসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় তাহা পাওয়া যায়?' বেন্ হুই উত্তর করিলেন, 'ভক্তি-উদ্‌বোধন-নামক একটি গ্রন্থে পাইবেন। এই পুস্তক পড়িয়াই কন্-ফুসীয় ধর্ম ছাড়িয়া আমি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি।'

ডাক্তার রিচার্ড্ এই বই আনাইলেন। পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি বই ছাড়িতে পারিলেন না। আর-একজন মিশনরি রাত্রি জাগিয়া তাঁহার পাশে কাজ করিতে-ছিলেন; তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এ আমি আশ্চর্য একটি খৃস্টান বই পড়িতেছি।'

ডাক্তার রিচার্ড্ যে বইটির কথা বলিয়াছেন তাহার মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত, অশ্বঘোষের রচনা। এই সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে; কেবল চীন ভাষায় ইহার অনুবাদ এখন বর্তমান আছে।[১]

বৌদ্ধধর্ম জিনিসটা কী সে সম্বন্ধে আমরা একটা

১ 'শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র' বা 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র'। এই গ্রন্থের মূল সংস্কৃত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইহার ইংরেজি অনুবাদ Asvaghosha's Discourse on the Awakening of Faith in the Mahāyāna, translated for the first time from the Chinese version by Teitaro Suzuki, Chicago, 1900.

পাদটীকা শান্তিনিকেতন চীন-ভবনের শ্রীসুজিতকুমার মুখো-পাধ্যায়ের সৌজন্যে।

ধারণা করিয়া লইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধর্মে ধর্মের আর-সমস্ত অঙ্গই আছে, কেবল ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থান নাই। *জ্ঞানে ইহার ভিত্তি এবং কর্মে ইহার মন্দিরটি গড়া। কিন্তু মন্দিরের মধ্যে কেহ নাই; সেখানে নির্বাণের অন্ধকার, ভক্তি সেখান হইতে নির্বাসিত। ✓

আমরা তো বৌদ্ধধর্মকে এইভাবে দেখি, অথচ দেখিতে পাইতেছি— বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে খৃস্টান এমন-কিছু লাভ করিতেছেন যাহার সঙ্গে তিনি আপন ধর্মের প্রভেদ দেখিতেছেন না এবং যাহার রসে আকৃষ্ট হইয়া কন্‌ফুসীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার প্রচারে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন, 'হাঁ, চারিত্রনীতির উপদেশে খৃস্টান-ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিল আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করে।' কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত, চারিত্রনীতির উপদেশ জিনিসটা মনোরম নহে; তাহা ঔষধ, তাহা খাদ্য নহে; তাহার সাড়া পাইলে ছুটিয়া লোক জড়ো হয় না, বরঞ্চ উল্টাই হয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যদি এমন-কিছু থাকে যাহা আমাদের হৃদয়কে টানে এবং পরিতৃপ্ত করে, তবে জানিব, তাহার মর্মটি, তাহার ধর্মটি সেই জায়গাতেই আছে।

ডাক্তার রিচার্ড্‌ অশ্বঘোষের গ্রন্থটির মধ্যে এমন-কিছু

দেখিয়াছিলেন যাহা নীতি-উপদেশের অপেক্ষা গভীরতর, পূর্ণতর ; যাহা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, যাহা আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতিমাত্র নহে। সেই জিনিসটি কোথা হইতে আসিল ?

সম্প্রতি ইংলণ্ডে কোনো সভায় কয়েকজন ভিন্নজাতীয় ব্যক্তি আপন আপন ধর্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। একজন জাপানী বক্তা তাঁহার দেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্যের ধর্মোপদেশ হইতে স্থানে স্থানে উদ্‌ধৃত করিয়া বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ আচার্যের নাম সোয়েন শাকু ; ইনি কামাকুরার এঙ্গাকুজি এবং কেঙ্কোজি মঠের অধ্যক্ষ। ইনি এক স্থানে বলিয়াছেন—

'আমরা বস্তুমাত্রের সীমাবদ্ধ বিশেষ সত্তা মানিয়া থাকি। সকল বস্তুই দেশে কালে বদ্ধ হইয়া কার্যকারণের নিয়মে চালিত হয়। বিষয়রাজ্যের বহুত্ব আমরা স্বীকার করি। এই সংসার বাস্তব, ইহা শূন্য নহে ; এই জীবন সত্য, ইহা স্বপ্ন নহে। আমরা বৌদ্ধরা একটি আদিকারণ মানি যাহা সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ও সর্বপ্রেমী। এই জগৎ সেই মহাপ্রজ্ঞা মহাপ্রাণের প্রকাশ। ইহার সকল বস্তুতেই সেই আদিকারণের প্রকৃতির অংশ আছে। কেবল মনুষ্যে নহে, পশু ও জড় বস্তুতেও আদিকারণের দিব্য স্বভাব প্রকাশমান হইতেছে।

'ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, আমাদের মতে একই বহু

এবং বহুই এক। এই জীবন এবং জগতের বাহিরে জগতের কারণকে খুঁজিতে যাওয়া ভ্রম। তাহা আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া এই জগতের মধ্যেই তাহার শেষ নহে, জগতের সমস্ত পদার্থসমষ্টিকে অতিক্রম করিয়াও সে আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে, এই বিষয়রাজ্য অসত্য নহে, ইহার মূল কারণ জ্ঞানস্বরূপ এবং তাহা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত।'

উপরে যাহা উদ্‌ধৃত করা গেল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত আমাদের যে ধারণা তাহার সহিত এই বৌদ্ধাচার্যের মতের মিল নাই। সম্ভবত কোনো কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গেও ইহার অনৈক্য হইবে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, কোনো কোনো বৌদ্ধসমাজে বৌদ্ধধর্ম এইরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং নামান্তর গ্রহণ না করিয়া ইহা বৌদ্ধধর্ম বলিয়াই পরিচিত। ইতিহাসের কোনো-একটা বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম বলিব— আর, যাহা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব খাদ্যকে আত্মসাৎ করিয়া আপন জীবনকে পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাকে বৌদ্ধধর্ম বলিব না— এই যদি পণ করিয়া বসি তবে কোনো জীবিত ধর্মকে ধর্ম নাম দেওয়া চলে না।

কোনো বৃহৎ ধর্মই একটিমাত্র সরল সূত্র নহে, তাহাতে নানা সূত্র জড়াইয়া আছে। সেই ধর্মকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা আপনার প্রকৃতির বিশেষত্ব-অনুসারে তাহার কোনো একটা সূত্রকেই বিশেষ করিয়া বা বেশি করিয়া বাছিয়া লয়। খৃস্টান-ধর্মে রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে ক্যাল্‌ভিন-পন্থীদের অনেক প্রভেদ আছে। দুই ধর্মের মূল এক জায়গায় থাকিলেও তাহার পরিণতিতে গুরুতর পার্থক্য ঘটিয়াছে। আমরা যদি কেবলমাত্র ক্যাল্‌ভিন-পন্থীদের মত হইতে খৃস্টান-ধর্মকে বিচার করি, তবে নিশ্চয়ই তাহা অসম্পূর্ণ হইবে।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। সকলেই জানেন এই ধর্ম হীনযান এবং মহাযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুই শাখার মধ্যে প্রভেদ গুরুতর। আমরা সাধারণত হীনযানমতাবলম্বী বৌদ্ধদের ধর্মকেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছি।

তাহার একটা কারণ, মহাযান-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় কারণ, যে পালি-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি পরিণত আকার ধারণ করে নাই।

ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে

হয়। পুরাতত্ত্ব-আলোচনার দ্বারা তাহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক সময় মিশনরিরা যখন আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করেন, তখন দেখিতে পাই, তাঁহারা কেবলমাত্র বই পড়িয়া বা সাময়িক বিকৃতির প্রতি লক্ষ করিয়া বিদেশীর ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা নিতান্তই অঙ্গহীন। বস্তুত শাস্ত্রবচন খুঁটিয়া লইয়া, টুকরা জোড়া দিয়া, ধর্মকে চেনা যায় না। তাহার একটি সমগ্র ভাব আছে। সেই ভাবটিকে ঠিকমত ধরা শক্ত এবং ধরিলেও তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া নির্দেশ করা সহজ নহে।

আমাদের দেশে যাঁহারা খৃস্টান-ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহাদের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, খৃস্টানের মুখ হইতেই তাঁহারা খৃস্টান-ধর্মের কথা শুনিতে পান, এইজন্য তাহার ভিতরকার সুরটা তাঁহাদের কানে গিয়া পৌঁছায়। যদি কেবল প্রাচীন শাস্ত্র পড়িয়া, বচন জোড়া দিয়া, তাঁহাদিগকে এই কাজটি করিতে হইত তবে অন্ধ যেমন হাত বুলাইয়া রূপ নির্ণয় করে তাঁহাদেরও সেই দশা ঘটিত। অর্থাৎ, মোটামুটি একটা আকৃতির ধারণা হইত, কিন্তু সেই ধারণাটাই সর্বোচ্চ ধারণা নহে। রূপের সঙ্গে যে বর্ণ, যে লাবণ্য, যে-সকল অনির্বচনীয় প্রকাশ আছে, তাহা তাঁহাকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া যাইত।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সেই দশা ঘটিয়াছে। পুঁথি-পড়া বিদেশী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের গ্রন্থের শুষ্কপত্র হইতে আমরা এই ধর্মের পরিচয় গ্রহণ করি। এই ধর্মের রসধারায় সেই পণ্ডিতদের চিত্ত স্তরে স্তরে অভিষিক্ত নহে। এক প্রদীপের শিখা হইতে আর-এক প্রদীপ যেমন করিয়া শিখা গ্রহণ করে তেমন করিয়া তাঁহারা এই ধর্মকে সমগ্র-ভাবে লাভ করেন নাই। এমন অবস্থায় তাঁহাদের কাছ হইতে আমরা যাহা পাই তাহা নিতান্ত মোটা জিনিস ; তাহা আলোকহীন, চক্ষুহীন, স্পর্শগত অনুভব মাত্র।

এইজন্য এইরূপ শাস্ত্র-গড়া বৌদ্ধধর্ম হইতে আমরা এমন জিনিস পাই না যাহা আমাদের অন্তঃকরণের গভীর ক্ষুধার খাদ্য জোগাইতে পারে। একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অনেক কাল পালি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের কথার আভাসে একদিন বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি এই আলোচনায় রস পান নাই, তাঁহার সময় মিথ্যা কাটিয়াছে।

অথচ এই ধর্ম হইতে কেহ রস পায় নাই এমন কথা বলিতে পারি না। ইহার মধ্যে একটি গভীর রসের প্রস্রবণ আছে যাহা ভক্তচিত্তকে আনন্দে মগ্ন করিয়াছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে ভক্তির বন্যা দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার সঙ্গে আমাদের দেশে বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলনের বিশেষ প্রভেদ দেখি না।

আমাদের দেশে এক বেদান্তসূত্রকে অবলম্বন করিয়া দুই বিপরীত মতবাদ দেখা দিয়াছে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ আর বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ। শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে অন্তত এ কথা বুঝা যায় যে, বৌদ্ধদর্শনের সংঘাতে এবং অনেক পরিমাণে তাহার সহায়তায় শঙ্করের এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু সেই দ্রাবিড় হইতেই যে প্রেমের ধর্মের স্রোত সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই বৈষ্ণবধর্মকেও কি এই বৌদ্ধধর্মই সঞ্জীবিত করিয়া তোলে নাই? আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধ মন্দিরে বৈষ্ণব দেবতা স্থান লইয়াছে, এক-কালে যাহা বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত তাহাই বিষ্ণুপদচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, রথযাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎসবকে বৈষ্ণব আত্মসাৎ করিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে আমরা যে বৈদিক দেবতাদিগকে দেখি তাঁহারা স্বর্গবাসী দিব্যপুরুষ। সংসারপাশে আবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করিবার জন্য পরমদয়া যে মানবরূপে মর্তলোকে আবির্ভূত— এই ভাবটির উদ্ভব কি সর্বপ্রথমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নহে? বৈদিক যুগে কি কোথাও আমরা ইহার কোনো আভাস পাইয়াছি?

জাপানী অধ্যাপক আনেসাকি 'হিবার্ট্ জর্নালে' খৃস্টান

ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনা করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে, এই দুই ধর্মধারার মূলে আমরা একটি জিনিস দেখিতে পাই— উভয় স্থানেই সত্য মানবরূপ গ্রহণ করিয়াছে, ভক্তি নরদেহ ধারণ করিয়াছে, প্রেমেতে এবং ভক্তিতে সত্যকে সম্মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য বিশ্বমানবের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন মানুষের প্রয়োজন হইয়াছে।

বস্তুত বৌদ্ধধর্মেই সর্বপ্রথমে কোনো-একজন মানুষকে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি করিয়া দেখা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি তাঁহার ভক্তদের চক্ষে মানুষের সমস্ত স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়াই যেন প্রতিভাত হইয়াছেন। তিনি যে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন গুরু তাহা নহে— তিনি যেন মূর্তিমান অসীমপ্রজ্ঞা, অসীমকরুণা। তিনি মুক্ত হইয়াও কেবল জীবকে দুঃখ হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন— সে তাঁহার কর্মফলের অনিবার্য বন্ধন নহে; সে তাঁহার প্রেমের দ্বারা, দয়ার দ্বারা স্বেচ্ছারচিত বন্ধন।

কোনো বিশেষ একজন মানুষকে এমন করিয়া অসীম করিয়া দেখা বৌদ্ধধর্মে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং যিশুকে ত্রাণকর্তা অবতাররূপে স্বীকার করা যে এই বৌদ্ধ মতেরই অনুসরণ করিয়া ঘটে নাই তাহা বলিতে পারিব না। বৌদ্ধধর্মের এই অবতারবাদ, এই ভক্তিবাদের দিকটাই বৈষ্ণব-

ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিণামরূপে বিরাজ করিতেছে এইরূপ আমার বিশ্বাস।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাধু হোনেন জাপানে বৌদ্ধধর্মের মধ্য হইতে যে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ অধ্যাপক আনেসাকি ধর্ম-ইতিহাস-আলোচনার আন্তর্জাতিক সম্মিলনসভায় বিবৃত করিয়াছিলেন। ভাগবত ধর্মের সঙ্গে তাঁহার সে ভক্তিধর্মের মর্মগত প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। তিনি বলিয়াছেন, অমিত বুদ্ধের দয়াতেই জীবের মুক্তি। এই অমিত সুখাবতী-নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের আনন্দলোকের অধীশ্বর। ইনি সর্বশক্তিমান, করুণাময়, মুক্তিদাতা। যে-কেহ ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবে সে বুদ্ধকে মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইবে ও মৃত্যুকালে সমস্ত পার্ষদমণ্ডলী-সহ অমিত আসিয়া তাহাকে আদরে গ্রহণ করিবেন। এই অমিতাভের জ্যোতি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত, দৃষ্টি মেলিলেই দেখা যায়; এই অমিতায়ুর প্রাণ মুক্তিধামে নিত্য-কাল উপলব্ধ, যিনি ইচ্ছা করেন লাভ করিতে পারেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, বুদ্ধ যেখানেই মানুষের জ্ঞানকে ছাড়াইয়া তাহার ভক্তিকে অধিকার করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার মানবভাব বিলুপ্ত হইয়াছে; সেখানে তাঁহার ধারণার সঙ্গে ভগবানের ধারণা এক হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের তিনটি মুখ— বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ। তাহার ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হইয়া আছে। যদিও এই তিনের পরিপূর্ণ সম্মিলনই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ আদর্শ, তবু দেশ কাল পাত্রের প্রকৃতি -অনুসারে সে আদর্শ বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তখন ইহার কোনো-একটা দিকই প্রবল হইয়া দেখা দেয়। হীনযান ও মহাযানে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হীনযানের দিকে যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্মে পূজাভক্তি বুঝি নাই, প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহৎসত্তাকে বৌদ্ধধর্ম বুঝি একেবারেই অস্বীকার করে— আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম নানা বিচিত্র রূপ রস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই।

কিন্তু আসল কথা, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই দুটা দিকই আছে। সমস্ত বাসনা ও কর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্বাণ-মুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে 'না' করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নহে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনোমতেই শ্রদ্ধেয় নহে।

এক দিকে স্বার্থপর বাসনাকে ক্ষয় ও অন্য দিকে স্বার্থত্যাগী প্রেমকে সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করিয়া বিস্তার করা এই দুই শিক্ষাই যেখানে প্রবল মাত্রায় একত্র মিলিত হইয়াছে, বুঝিতেই হইবে, শূন্যতাই সেখানে লক্ষ্য নহে। কোনো-এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদলের বা কোনো বিশেষ বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে পোষক প্রমাণ থাকিলেও আমরা তাহাকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। মাটি চাষ করাটাকেই মুখ্য বলিয়া গণ্য করিব এবং ফসল বোনাটাকেই গৌণ বলিয়া উপেক্ষা করিব, ইহা হইতেই পারে না।

এই ফসলের কথাটা যেখানে আছে সেইখানেই মানুষের মন বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই আকর্ষণেই কঠিন সাধনার দুঃখ মানুষ মাথায় করিয়া লইয়াছে। এক-দল তার্কিক এমনভাবে তর্ক করে যে, যেহেতু ক্ষেত্রকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে বলা হইয়াছে, অতএব সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া ফেলাই এই উপদেশের তাৎপর্য। আগাছা উৎপাটন করিয়া ফেলাই যে তাহার উদ্দেশ্য সে কথা বুঝিতে বাকি থাকে না যখন শুনিতে পাই 'প্রেমের বীজ মুঠা মুঠা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিবে'। এই প্রেমের ফসল নির্বাণ নহে, আনন্দ, সে কথা বলাই বাহুল্য।

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন না

ও তিনি ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন, ইতিবুত্তকং -নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন —

যস্‌স রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা
তম্‌ ভাবিতত্তঞ্‌ঞতরম্‌ ব্রহ্মভূতম্‌ তথাগতম্‌
বুদ্ধম্‌ বেরভয়াতীতম্‌ আহু সব্বপহায়িনন্তি।

যাঁহার রাগ দ্বেষ এবং অবিদ্যা তিরোহিত হইয়াছে তাঁহাকে ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মভূত, তথাগত এবং বৈর ও ভয়াতীত এবং সর্বত্যাগী বুদ্ধ বলা হয়।

ব্রহ্মভূত শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করেন।

মহেশবাবু যে শ্লোকটি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মভূত ব্যক্তির যে-সকল লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ত্যাগ-মূলক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র ত্যাগের ধর্ম নহে। তা যদি হইত তবে তাহার মধ্যে প্রেমের কোনো স্থান থাকিত না।

বস্তুত বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বই এই যে, এক দিকে তাহার যেমন কঠোর ত্যাগ অন্য দিকে তাহার তেমনি উদার প্রেম। ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানের ধর্ম, ধ্যানের ধর্ম নহে। বুদ্ধদেব নিজের জীবনেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি যখন দীর্ঘকাল তপস্যার পর তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন তখন যাহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিল তাহাদের শ্রদ্ধা

তিনি হারাইলেন। কারণ, তখনকার বিশ্বাস ছিল এই যে, তপশ্চরণের দ্বারা সমাধিপ্রাপ্তিই ব্রহ্মলাভ, তাহাই চরম সিদ্ধি। কিন্তু যখন বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন তখনই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কর্ম বিশুদ্ধ কর্ম, কারণ তাহাতে ভয় লোভ মোহ হিংসা নাই; তাহা স্বার্থবন্ধনের অতীত; তাহা দয়ার কর্ম, প্রেমের কর্ম।

অতএব যেখানে বাসনার ক্ষয় হয় সেখানে যে কিছুই বাকি থাকে না তাহা নহে। সেখানে সমস্ত আসক্তি ও রিপুর আকর্ষণ দূর হইয়া যায় বলিয়াই দয়া প্রেম আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই পরিপূর্ণতাই ব্রহ্মের স্বরূপ। অতএব যিনি ব্রহ্মভূত হইবেন, ব্রহ্মের স্বরূপে বিরাজ করিবেন, তাঁহাকে কেবল ত্যাগের রিক্ততা নহে, ত্যাগের দ্বারা প্রেমের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে।

এইজন্যই ব্রহ্মবিহার কাহাকে বলে বুদ্ধ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন —

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্ব-দিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কী দাঁড়াইতে কী চলিতে, কী বসিতে কী শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এইরূপ বিশ্বব্যাপী প্রেমের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করাকেই বুদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, বুদ্ধ ব্রহ্মকে প্রেমস্বরূপ বলিয়াই জানিয়াছেন, ব্রহ্ম তাঁহার কাছে শূন্যতা নহে।

এই প্রেমকেই যদি সর্বব্যাপী পরম সত্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সংসারকে একেবারে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে কেন?

করুণা বলো, প্রেম বলো, আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। প্রেমের বিষয়কে বাদ দিয়া প্রেমের সত্যতা নাই।

মহাযান-সম্প্রদায়ীরা এ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা প্রণিধানের যোগ্য। পরে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

যিনি নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অথচ যিনি আধুনিক কালের পাঠকসমাজের কাছে নিজের মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত

করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারই নিকট হইতে আমরা এ সম্বন্ধে সহায়তা প্রত্যাশা করিতে পারি।

জাপানী বৌদ্ধ পণ্ডিত তাইতারো সুজুকির নিকট হইতে এ বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। তিনি অশ্বঘোষের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন এবং মহাযান বৌদ্ধ মতেরও ব্যাখ্যা করিয়া বই লিখিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থগুলি আমরা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু তাঁহার পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইংরেজি Quest পত্রে সম্পাদক-মহাশয় যে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায় যে, যেমন বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কেবলমাত্র শাঙ্কর ভাষ্য পড়িলে ভারতে প্রচলিত বেদান্তকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হইল মনে করা যায় না, সেইরূপ পালিগ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণত য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন, বৌদ্ধধর্মের মর্মগত সত্য-সন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে।

এ কথা স্পষ্টই মনে হয়, ভারতবর্ষের চিত্ত হইতে জ্ঞানের ধারা এবং প্রেমের ধারাকে বুদ্ধদেব একত্রে আকর্ষণ করিয়া একদিন মিলাইয়াছিলেন। সেই মিলনের বন্যায় একদিন পৃথিবীর দেশ বিদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে এত বড়ো মিলনের একটি বিপুল শক্তি ভারতবর্ষ হইতে

যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা নহে। বৌদ্ধযুগের পরবর্তী দর্শনে পুরাণে কোথাও বা নবীনরূপে, কোথাও বা পুরাতনকে নূতন আকার দিয়া, সেই ধারা নানা শাখা প্রশাখায় নানা নামে আজও প্রবাহিত হইতেছে।

আমরা পূর্বে এক স্থানে আভাস দিয়াছি, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের একটা সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম বৈষ্ণবধর্মকে সৃষ্টি করে নাই। তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। গুরুতে দেবতা জ্ঞান করা এবং তাঁহার প্রসাদেই মুক্তি এই কথা স্বীকার করা, আমাদের আধুনিক পৌরাণিক ধর্মে দেখা যায়— আমার বিশ্বাস, এইরূপ গুরু-বাদের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম হইতে। ইহার কারণ এই যে, মানুষের ভক্তিবৃত্তি একটা সত্য পদার্থ, তাহাকে খাদ্য জোগাইতেই হইবে। যে ধর্মের যেমন মতই হউক-না কেন, ভক্তির আশ্রয় কাড়িয়া লইলে ভক্তি যেমন করিয়া হউক আপনার একটা আশ্রয় খাড়া করিয়া লয়। বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে স্পষ্ট করিয়া ভক্তির কোনো চরম আশ্রয় নির্দেশ করেন নাই। এইজন্য তাঁহার অনুবর্তীদের ভক্তিবৃত্তি তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে এবং ভক্তির স্বাভাবিক চরম গতি যে পরমপুরুষে, বুদ্ধকে তাঁহার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়াছে। এইরূপে বৌদ্ধধর্মে মানুষের ভক্তি অগত্যা মানুষকেই আশ্রয় করিয়াছে এবং সেই সমস্ত সীমাকে ভেদ

করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া, ভগবানের মধ্যে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অশ্বত্থ গাছ যখন মন্দিরের ভিত্তিতে জন্মায় তখন সেই মন্দিরকে নিজের প্রয়োজন-অনুসারে ভাঙিয়া-চুরিয়া নানাখানা করিয়া ফেলে— কেননা, যেখানে তাহার খাদ্য, যেমন করিয়া হউক, সেখানে তাহাকে শিকড় পাঠাইতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম একদা দেবতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই এই ধর্মে ভক্তি মানুষকে আশ্রয় করিয়াছিল ; কিন্তু মানুষের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ খাদ্য নাই, এই কারণে সে বাঁকিয়া-চুরিয়া যেমন করিয়া পারে আপন আশ্রয়কে অতিক্রম করিয়া নিত্য আশ্রয়ের মধ্যে মুক্তি-লাভের চেষ্টা করিয়াছে। এমনি করিয়া এইখানে গুরুবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

মুক্তির পক্ষে আত্মশক্তিই প্রধান এই কথার উপরেই বৌদ্ধধর্মে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণও ছিল। ভারতবর্ষে যে সময় বুদ্ধের আবির্ভাব সে সময়ে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে এই কথার খুব প্রভাব ছিল। হোমাদি করিয়া দেবতাদিগকে খুশি করিতে পারিলেই তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি-দ্বারা মানুষ সহজেই সদ্‌গতি লাভ করিবে এই প্রকার তখন বিশ্বাস ছিল। ইহারই বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইয়াছিল, সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য, সাধু কর্মের

দ্বারাই মুক্তির পথ সুগম হয়। মুক্তি যথার্থ সাধনার দ্বারাই সাধ্য, এখানে অল্পমাত্রও ফাঁকি চলে না।

কিন্তু মানুষ জানে আত্মশক্তিই পর্যাপ্ত নহে। শুধু চোখ দিয়া আমরা দেখি না, বাহিরের আলো নহিলে আমাদের দেখা চলে না। তাহার একটা দিক আছে শক্তির দিক, আর-একটা দিক আছে নির্ভরের দিক। এই দুইয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, ইহার একটাকেই একান্ত করিয়া দিলে, এমন একটা প্রতিক্রিয়ার বিপ্লব উপস্থিত হয় যে উল্টা দিকটা অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠে।

বৌদ্ধধর্ম আত্মশক্তিতে মানুষকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার পক্ষে যত জোরে টান দিয়াছিল তত জোরেই সে দৈবশক্তির দিকে ছুটিয়াছে। এমন দিন আসিল যেদিন মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধের প্রতি বৌদ্ধের নির্ভরের আর সীমা রহিল না। হোনেন বলিয়াছেন, বড়ো বড়ো ভারী পাথর যেমন জাহাজকে আশ্রয় করিয়া অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া যায়, তেমনি পর্বতাকার পাপের বোঝা -সত্ত্বেও আমরা অমিত বুদ্ধের দয়াবলেই জন্মমৃত্যুর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি। হোনেন স্পষ্টই বলেন, 'কখনো মনে করিয়ো না আমরা স্বকর্মের বলে নিজের আন্তরিক ক্ষমতাতেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইতে পারি, অসাধুও বুদ্ধের শক্তি -প্রভাবে পরমগতি লাভ করে।'

এই-যে কথা উঠিল, বুদ্ধের প্রসাদ এবং শক্তিই আমা-

দিগকে ত্রাণ করিতে পারে, এইখানেই মানবগুরুর অলৌকিক ক্ষমতা প্রথম স্বীকার করা হইয়াছে। অবশ্য, মানবকে এখানে যেভাবে কল্পনা করা হয় তাহাতে তাহার মানবত্বই থাকে না, সর্বত্রই গুরুবাদের সেই বিশেষত্ব; গুরুর মধ্যে এমন শক্তির আরোপ করা হয় যাহা মানুষের শক্তি নহে।

সুফিধর্মেও গুরুবাদের এইরূপ প্রবলতা দেখা যায়। অথচ বিশুদ্ধ মুসলমান-ধর্ম এই প্রকার গুরুবাদের বিরুদ্ধ। আমার বিশ্বাস, এশিয়াখণ্ডে মানবগুরুকে দৈবশক্তিসম্পন্ন ত্রাণকর্তা বলিয়া পূজা করিবার যে প্রথা চলিয়াছে বৌদ্ধধর্ম হইতেই তাহার উৎপত্তি। সুফিধর্মের এই গুরুবাদ পুনশ্চ আমাদের দেশেই বাউল ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এমনি করিয়া বৌদ্ধধর্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া গুরুবাদ ও অবতারবাদ নব নব আকারে আবর্তিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্মেই মানবকে দেবতার স্থান প্রথম দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর হইতে মানব সেই দেবসিংহাসনের অধিকার আর সহজে ছাড়িতে পারিতেছে না। মানুষের মন একবার যখন এই অদ্ভুত কল্পনায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তখন এই পথে চিন্তা প্রবাহিত হওয়ার বাধা সে আর দেখিতেছে না।

নাম জপ করা এবং নামাবলী-আবৃত্তিও আমরা মহাযান

-বৌদ্ধসম্প্রদায়ে দেখিতে পাই। হোনেন বলিয়াছেন, যে-কেহ সর্বান্তঃকরণে অমিতের নাম স্মরণ করিবে তাহাদের কেহই পুণ্যজীবনলাভে বঞ্চিত হইবে না। যে-কোনো প্রাণী বুদ্ধের নাম স্মরণ করে তাহাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ইহাও হোনেনের উপদেশ। বস্তুত বুদ্ধই যখন বৌদ্ধের ভক্তির একমাত্র ও চরম লক্ষ্য তখন তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার নামই তাহাদের প্রধান সম্বল হইয়াছিল। তিনি নাই, কিন্তু তাঁহার নাম আছে। মানুষের অভাবে মানুষের এই নামকে আশ্রয় না করিয়া উপায় কী?

বৌদ্ধধর্মে একদিন মুক্তির পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল, সংযম এবং ত্যাগের কঠোরতার সীমা ছিল না। এই বৌদ্ধ-ধর্ম করুণাকে আদর করিয়াছে, কিন্তু ভক্তিকে অস্বীকার করিয়াছিল। সেই ভক্তি আসিয়া একদিন আপন অবমাননার প্রতিশোধ লইয়াছে। সাধনার সমস্ত কঠোরতা সে অপহরণ করিয়াছে। পাপের বোঝা লইয়াও মানুষ উদ্ধার পাইবে এই কথা প্রচার করিয়াছে, কেবল নাম- স্মরণে ও উচ্চারণেই মুক্তি হইতে পারে এই আশ্বাস দিয়া মানুষের পুণ্যচেষ্টাকে শিথিল করিয়া দিয়াছে। অবশেষে এই নামের মাহাত্ম্যে নির্ভর এত দূর পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, অজ্ঞানে ভ্রমক্রমে নাম-উচ্চারণ করিলেও মহাপাপী উদ্ধার পায় এমন বিশ্বাস ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোনো সত্যকে অবজ্ঞা করিয়া কোনো ধর্ম বাঁচে না। জ্ঞানকে হতমান করিলে সে তাহার শোধ লয়, ভক্তিকে অপমান করিলে সে তাহা ক্ষমা করে না। যেখানে অভাব আছে পূরণ করিতে করিতে, যেখানে ত্রুটি আছে সংশোধন করিতে করিতে, ধর্ম অগ্রসর হইয়া চলে। যদি না চলে তবে মানুষের উপায় নাই। এইজন্যই কোনো বড়ো ধর্মকে কোনো এক কালে এক অবস্থায় এক ভাবে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে ঠিক দেখা হয় না। এক দিকে হেলিলে অন্য দিকে হেলিয়া সে আপনার ভারসামঞ্জস্য উদ্ধার করে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই দিকেই সে হেলিয়া থাকিতে পারে না— মধ্যপথকে আশ্রয় করিবার জন্যই তাহার চেষ্টা। একেবারেই না যদি করে তবে নৌকা-ডুবি।

বৌদ্ধধর্ম যে কী, তাহা নির্ণয় করিবার বেলায় তাহার সচলতার প্রতি লক্ষ করিতে হইবে। হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে। বৌদ্ধধর্ম সংসারের অতীত কোনো পূজনীয় সত্তাকে স্বীকার যে করে না এ কথাকে আমরা বৌদ্ধধর্মের নিত্য সত্য বলিয়া মানি না— এবং বৌদ্ধধর্ম যে আত্মশক্তির সাধনাকে ভক্তির জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে এ কথাও তাহার চিরসত্য নহে। বৌদ্ধধর্ম এখনো মানুষের জ্ঞান ভক্তি কর্মের মধ্যে

আপনার অমর সত্যকে বাধামুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সেই লক্ষ্য-অভিমুখে চলিয়াছে সকল ধর্মেরই গম্যস্থান যেখানে।

১৩১৮

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, 'সে কথা যথার্থ— মানুষ দীন নহে, হীন নহে, কারণ মানুষের যে শক্তি— যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।'

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে

দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহূর্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নব-হিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল— মানুষের ক্ষুদ্র কাজে কর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষলীলা, অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটোবড়োর ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল; প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

১৩১০

২

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি; স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান-

বাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে— বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্য-বশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি।

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং॥
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্ব-

দিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কী দাঁড়াইতে কী চলিতে, কী বসিতে কী শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে— ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই-যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে ; আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্যে হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত-আবশ্যকের-অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না ; এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

১৩১১

৩

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণচিত্তে ধ্যানদ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর

খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন ? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই, মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ, সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন, 'তুমি লোভ কোরো না, হিংসা কোরো না, বিলাসে আসক্ত হোয়ো না।' যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন ক'রে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী ? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

৯ চৈত্র ১৩১৫

৪

বুদ্ধদেব যে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী? সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখ-স্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়ো রকম ক'রে ত্যাগ, খুব বড়ো রকম ক'রে ব্রত-পালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড়ো ক'রে দেখায় ব'লে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

১৪ চৈত্র [১৩১৫]

৫

বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধ-ত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং'এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয় তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও-না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না; সমস্তকেই সত্যময় ক'রে, পূর্ণতম

ক'রে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

৭ বৈশাখ [১৩১৬]

৬

বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র প'ড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান ক'রে মুক্তিলাভ করা যায়, এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ ক'রে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার ক'রে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় ক'রে ফেললে তবেই মুক্তি হয়; কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে, বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ ক'রে বনে বনে, পথে পথে, ফিরতে হয়েছে।

৭ পৌষ [১৩১৬]

৭

বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সে দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না— যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল

পরিচয়। যদি দুঃখ-দূরই চরম কথা হয় তা হলে বাসনা-লোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়—কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ—আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে—বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়—এইজন্যই অহংকে নির্বাপিত ক'রে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে। আমার 'পূর্ণিমা' বলে চিত্রা'র একটা কবিতা পড়েছ? তাতে আছে, একদিন সন্ধ্যার সময় বোটে বসে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ইংরেজি বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যেমনি বাতি নিবিয়ে দিলুম অমনি দেখি নৌকার সমস্ত জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা এসে আমার কক্ষ প্লাবিত করে দিলে। ঐ ছোট্ট একটি বাতি আমার টেবিলে জ্বলছিল ব'লে আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না আমার ঘরে প্রবেশ করতেই পারে নি—বাইরে যে এত অজস্র সৌন্দর্য দ্যুলোক ভূলোক আচ্ছন্ন করে অপেক্ষা করছিল তা আমি জানতেও পারি নি। অহং আমাদের সেইরকম জিনিস—অত্যন্ত কাছে এই জিনিসটা আমাদের সমস্ত বোধশক্তিকে চার দিক থেকে এমনি আবৃত করে রেখেছে যে অনন্ত-আকাশ-ভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ করতেই পারছি

নে—এই অহংটার যেমনি নির্বাণ হবে অমনি অনির্বচনীয় আনন্দ এক মুহূর্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলছেন। জগতে যে অনন্ত আনন্দ বিরাজমান তারও যে ওই প্রকৃতি—সে যে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্‌ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন—নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চার দিকে ভিড় করে আসত না।

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

৮

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই

পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি; পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

১৩১৯

৯

বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্য-ভারতবর্ষ ও হিন্দু-ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেই-সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝ-খানকার বেড়াগুলি একধর্মবন্যায় ভাঙিয়াছিল— শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্মের আহ্বানে ভারত-বাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তার পরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিকযুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ। এই যুগে আর্য ও অনার্য এক গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে

আদান-প্রদান ও রফানিষ্পত্তির চেষ্টা হইতে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন ; তাই সকল দিকেই বেশ সুসংগত রকমে রফা হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আভ্যন্তরিক নানা অসংগতির জন্য আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্বল রহিয়াছি ; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্মবিশ্বাসে পদে পদেই বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া আমাদিগকে চলিতে হয়— যাহা-কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মিলাইয়া লওয়া নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি।

যাহাই হউক, আমাদের এই বর্তমান যুগকে যদি ঠিক-মত চিনিতে হয় তবে পূর্ববর্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালোরূপ পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ইংরেজ ঐতি-হাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর। শ্যাম, চীন, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইজন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মতো হইয়াছিল যাহার ভিতর দিয়া নানা জাতির নানা ক্রিয়াকর্ম

মন্ত্রতন্ত্র পূজার্চনা ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্থনদণ্ডের দ্বারা মথিত হইয়াছে।

এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্মের নিজেরই বিশুদ্ধ স্বরূপগত, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণ-জনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলি নূতন নহে ; ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি। দিনের বেলায় যেমন তারা দেখা যায় না তেমনি বৈদিক কালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে ইহারাই আর-সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করিবার চেষ্টা, যাহা নিতান্ত অনার্য তাহাকে আর্যবেশ পরাইবার প্রয়াস, ইহাই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা।

১৩২৬

১০

একদিন বুদ্ধ বললেন, আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব।

দুঃখ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক, সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে!

১৭ ভাদ্র ১৩৩১

১১

ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হ'লে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে ব'সে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ক'রে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম। দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল, যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয় নি;

এই যোগ উদ্যত তরবারির জোরেও নয় ; এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়, নিজে দুঃখ স্বীকার ক'রে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্যভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্‌সের ইতিহাসে স্থান পায় নি ব'লে আমরা এ'কে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু এ'কে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও রয়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানির সুগভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার শুনেছি যে, এই-সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারত-বর্ষ থেকে এসেছে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হল। সত্যের যে বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই কূল উপ্‌চিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিণীতে আজ তা তলায় নেমে আসছে, কিন্তু তার জল-সঞ্চয় আজও দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেই-সকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা, ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেই-সব জায়গাতেই।

শ্রাবণ ১৩৩৪

১২

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও, যথেষ্ট স্থান আছে। জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে; তাতে বলেছে, যুগ-যুগ ধ'রে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালো-মন্দ'র যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধ'রেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দ'র ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে; তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প ক'রে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয়, কেননা আপনার দিকেই তার টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে অভিব্যক্তি তার প্রণালীপরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের 'পরে আঘাত লাগছে। সেই আঘাত যে পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই যে তাঁর

কোনো-এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতককথা-লেখকের একটুও বাধত না। কেননা, গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌঁচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতক-কথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হয়ে উঠল। সেইজন্যেই এত বড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ [১৩৩৪]

১৩

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে যাবৎ নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রী-স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে— একেই বলে ব্রহ্মবিহার।

এত বড়ো উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোঽহংতত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।

অথর্ববেদ বলেন, তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে— যিনি বিদ্বান্ তিনি মানুষকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বৃহৎ বলেই জানেন। সেইজন্যে তিনি তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন দুঃসাধ্য কর্মকে, অপরিমিত ত্যাগকে। যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্— যাঁরা ভূমাকে জানেন মানুষে, তাঁরা জানেন পরম দেবতাকেই। সেই মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন —

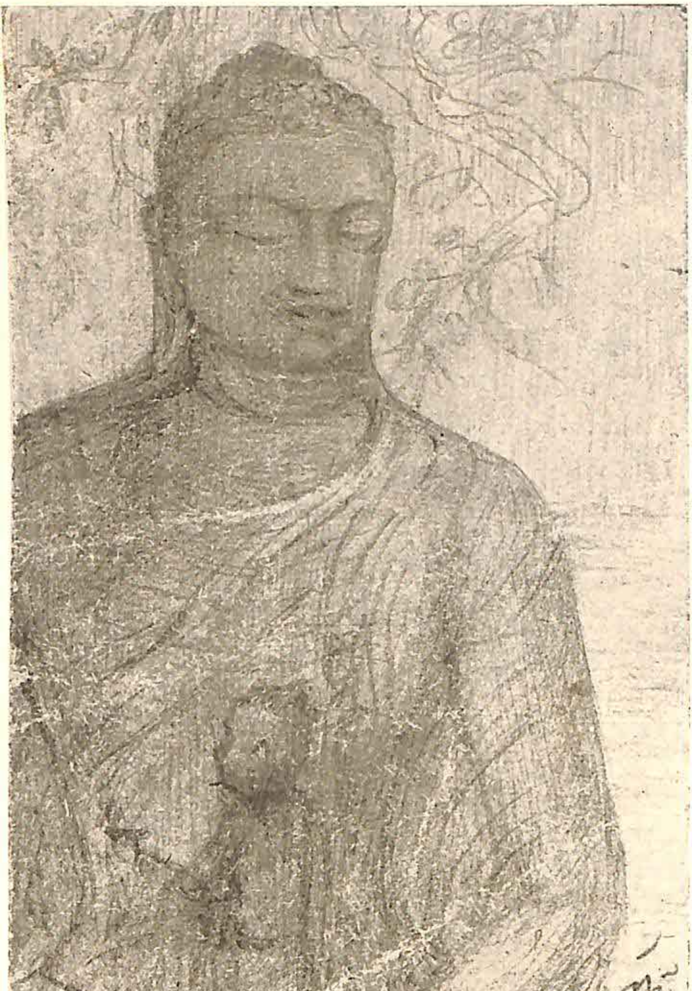
মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে। মাথা গ'নে বলব না, কজন এই উপদেশ পালন করতে পারে। সেই গণনায় নয় সত্যের বিচার।

মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন; বলেছিলেন, অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে। এই বাণী অসংকোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।

[১৩৩৯]

—



আরতি

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

বুদ্ধজন্মোৎসব

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোরকুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

এস দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা—
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকারভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর' মোহ,
উজ্জ্বল কর' জ্ঞানসূর্য-উদয়-সমারোহ—
প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

বুদ্ধদেব

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন' তব দক্ষিণ পাণি—
তব শুভসংগীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

২১ ফাল্গুন ১৩৩৩

সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম-অনুসারে পঠনীয়

সকল কলুষ-তামস হর', জয় হোক্ তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চন কর' নিখিল ভুবনময়।
জয় হোক্ তব জয়!
মহা শান্তি, মহা ক্ষেম,
মহা পুণ্য, মহা প্রেম!

জ্ঞান সূর্য্য-উদয় ভাতি
ধ্বংস করুক তিমির রাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি' অপগত কর' ভয়,
জয় হোক্ তব জয়!
মহা শান্তি, মহা ক্ষেম,
মহা পুণ্য, মহা প্রেম!

মোহমলিন অতি দুর্দ্দিন, শঙ্কিত চিত পান্থ,
জটিল গহন পথসঙ্কট সংশয় উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ,
দুর্গতিভয় করহ হরণ;
দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়।
জয় হোক তব জয়!
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকলকলুষতামসহর

সকল কলুষতামস হর',
জয় হোক তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চন কর'
নিখিলভুবনময়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

জ্ঞানসূর্য-উদয়ভাতি
ধ্বংস করুক তিমিররাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি
অপগত কর' ভয়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

মোহমলিন অতিদুর্দিন—
শঙ্কিতচিত পান্থ
জটিলগহনপথসংকট-
সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।

বুদ্ধদেব

করুণাময়, মাগি শরণ—
দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ
মুক্তির পরিচয়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম !

বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩৩৮

বুদ্ধদেবের প্রতি

সারনাথে মূলগন্ধকুটিবিহার-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ—
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান্।
খুলে যাক রুদ্ধ দ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।

দার্জিলিং
২৪ অক্টোবর ১৯৩১ [১৩৩৮]

বোরোবুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমত উঠেছে অম্বরে
অরণ্যের বন্দনমর্মরে ;
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি।

নারিকেলবনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
ধ্যানমগ্ন-আঁখি।
উচ্চে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগ-যুগান্তরে।
অপরূপ অমৃত অক্ষরে
লিখিল বিচিত্র লেখা ; সাধকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা—
সর্বকাল সর্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে ভাষার লিপির লিখন।

সে লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,
সে লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে।

সে লিপির বাণী সনাতন
করেছে গ্রহণ
প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।

অদূরে নদীর কিনারাতে
আল-বাঁধা মাঠে
কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে—
আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।
কালের সে লুকাচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার,
বলে অবিশ্রাম—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

প্রাণ যার দু দিনের, নাম যার মিলালো নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

কত যাত্রী কত কাল ধ'রে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কতদিন
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
বিপুল ইঙ্গিতপুঞ্জ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

অর্থ আজ হারায়েছে সে যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতিকুহেলিকা।
অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণবিলাসী—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।
চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা।
বেগ শুধু বেড়ে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে—
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে।

অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া।
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

বোরোবুদুর। যবদ্বীপ
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ [১৩৩৪]

সিয়াম

প্রথম দর্শনে

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পুরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে
আনন্দমুখর উদ্‌বোধন—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারি ভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্তিতে কর্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,
আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে,
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে—
সে মন্ত্র অমৃতবাণী, হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থ সমীরণে।

সে মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।
সে মন্ত্র-ভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুবকেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে—
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে—
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।

সে বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে শেষ,
নবযুগযাত্রাপথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ।
সে বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানসরত্নহার।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি

রচিয়া তুলেছ তুমি সুমহৎ জীবনমন্দির,
পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে,
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির-বিজয়স্তম্ভে-সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।
সে অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,
আজি আমি তারে দেখি লব।

ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন-অঙ্গন-সীমা

সিয়াম

অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে—
যে যুগের গিরিশৃঙ্গ-'পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।

ব্যাঙ্কক
১১ অক্টোবর ১৯২৭ [১৩৩৪]

—

রবীন্দ্রনাথ 'যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি' করিতেন, কবিতায় গানে ধর্মতত্ত্বালোচনায় বারংবার তিনি তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন— বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের সার্ধদ্বিসাহস্রিক জয়ন্তী-উৎসব-উপলক্ষে সেগুলি এই পুস্তকে সমাহৃত হইল।

এই গ্রন্থের 'বুদ্ধদেব' ও 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' প্রবন্ধ, এবং বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গের সপ্তম সংকলন ইতিপূর্বে কোনো পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। কোন্ রচনা কোন্ গ্রন্থ বা পত্রিকা হইতে গৃহীত তাহা নিম্নে নির্দেশ করা হইল।

রচনা	আকর গ্রন্থ, পত্রিকা ও প্রবন্ধ	
প্রার্থনা	পরিশেষ	
বুদ্ধদেব	প্রবাসী। আষাঢ় ১৩৪২	
ব্রহ্মবিহার	শান্তিনিকেতন ১	
বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। পৌষ ১৩১৮	
বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ		
	১ বিচিত্র প্রবন্ধ	: মন্দির
	২ ধর্ম	: উৎসবের দিন
	৩ শান্তিনিকেতন ১	: আদেশ
	৪ শান্তিনিকেতন ১	: ভূমা
	৫ শান্তিনিকেতন ১	: মুক্তির পথ
	৬ শান্তিনিকেতন ২	: ভক্ত
	৭ প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৮	: মৈত্রীসাধন
	৮ পথের সঞ্চয়	: যাত্রার পূর্বপত্র
	৯ ইতিহাস	: ভারত-ইতিহাস-চর্চা

১০ বিশ্বভারতী : ১১-সংখ্যক প্রবন্ধ

১১ কালান্তর : বৃহত্তর ভারত

১২ যাত্রী : জাভাযাত্রীর পত্র, ১৯

১৩ মানুষের ধর্ম : তৃতীয় অধ্যায়

বুদ্ধজন্মোৎসব নটীর পূজা, পরিশেষ

সকলকলুষতামসহর নটীর পূজা

বুদ্ধদেবের প্রতি পরিশেষ

বোরোবুদুর পরিশেষ

সিয়াম : প্রথম দর্শনে পরিশেষ

যে-সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলির বর্তমানে-প্রচলিত সংস্করণ দ্রষ্টব্য। কোনো-কোনো স্থলে পূর্বপ্রচলিত সংস্করণে রচনাগুলি নাই।

'বুদ্ধদেব' প্রবন্ধটি কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে বুদ্ধজন্মোৎসব উপলক্ষে অভিভাষণের অনুলিপি, বক্তা-কর্তৃক পুনর্লিখিত।

বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গের সপ্তম সংকলন, 'মৈত্রীসাধন', শান্তিনিকেতনের পূর্বতন অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র।

বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ প্রবন্ধে, মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের যে প্রবন্ধ উল্লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে তাহা 'বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ' আখ্যায় ১৩১৮ শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

—

মূল্য ১·৭০ টাকা

১১১